গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ১২ সংখ্যা | ৪ - ১০ নভেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জন্মশতবর্ষে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

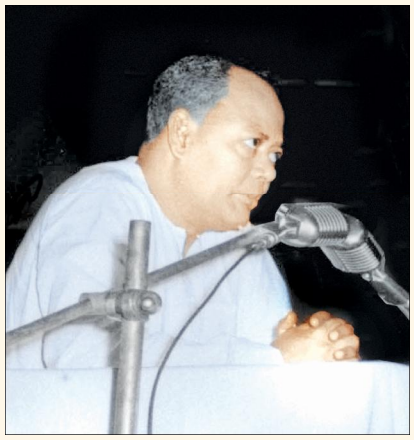

“শুধু বিপ্লব চাই— এটা কোনও বিপ্লবী চেতনা নয়। তাই শ্রমিক শ্রেণি, সর্বহারার কথা আমি চিন্তা করি— এটাও কোনও সর্বহারা শ্রেণিচেতনা নয়। সঠিক বিপ্লবী চেতনা হল, সঠিক সর্বহারা শ্রেণিচেতনা, আর সঠিক সর্বহারা শ্রেণিচেতনা হল সঠিক পার্টিচেতনা— অর্থাৎ আপনারা সঠিক বিপ্লবী পার্টি চিনতে পেরেছেন কি না।”

প্রচারের আলো দিয়ে গাঢ় অন্ধকার ঢাকা যায় না

লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার মতো ঘটনাতেও বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার লজ্জা পেয়েছে এমন উদাহরণ খুঁজে বার করা অসম্ভব। তাই আয়ারল্যান্ড ও জার্মানির দুই আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশ্বজুড়ে চালানো সমীক্ষাতে ভারত ক্ষুধা সূচকে ‘উদ্বেগজনক’ স্থানে দাঁড়ালেও সরকার তথা বিজেপি কোনও লজ্জা বোধ করেনি। শুধু তাই নয়, পুরো সমীক্ষাটাকেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সমীক্ষা দেখিয়েছে ১২১টি দেশের মধ্যে ১০৭ নম্বর স্থানে দাঁড়িয়ে আছে ভারত। মূলত চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রতি বছরই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের ভিত্তিতে বিশ্ব ক্ষুধা সূচক নির্ণয় করে তারা। চারটি বিষয় হল—মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ সঠিক ক্যালরির খাদ্য থেকে বঞ্চিত, ৫ বছরের মধ্যে কত শতাংশ শিশুর উচ্চতা বয়সের তুলনায় কম (চাইল্ডহুড স্টান্টিং), বয়স এবং উচ্চতার অনুপাতে শিশুদের কম ওজন (চাইল্ডহুড ওয়েস্টিং) এবং ৫ বছর বয়সের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার। ভারতের অবস্থান এই সবকটি নিরিখেই বেশ খারাপ। এর মধ্যে চাইল্ডহুড ওয়েস্টিংয়ের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে নিচে। এই রিপোর্ট আরও দেখিয়েছে, ২০১৪ সাল থেকে সামগ্রিক জনসংখ্যার জন্য ন্যূনতম পুষ্টি এবং শিশুদের গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির দিক থেকে ক্রমাগত খারাপ অবস্থানে যাচ্ছে।

ভারত রাষ্ট্রসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট কর্মসূচির অন্যতম সূত্রগুলি অনুসরণ করেই সমীক্ষকরা বিশ্বের ১২১টি দেশে সমীক্ষা চালিয়ে এই রিপোর্ট তৈরি করেন। এই বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের থেকে নিচুতে। একমাত্র আফগানিস্তান ভারতের নিচে থেকে নরেন্দ্র মোদি সাহেবদের কিছুটা মান বাঁচিয়েছে। কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপি যথারীতি চক্রান্তের অভিযোগ তুলে বলেছে, নরেন্দ্র মোদির রামরাজ্যের বদনাম করতেই বিদেশিরা এই মিথ্যা ছড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রশ্ন তুলেছে অপুষ্টি মাপার পদ্ধতি এবং শিশুদের অপুষ্টি ও কম ওজনকে অপুষ্টির সামগ্রিক সূচক বলা যায় কি না তা নিয়ে। যদিও দ্য স্ক্রোল, এনডি টিভির মতো সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিবেদনে উঠে এসেছে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ, পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মত হল সঠিক পদ্ধতিতে নেওয়া পরিসংখ্যান এবং ভারত সরকারের হাউসহোল্ড ফ্যামিলি সার্ভের তথ্যকেই এই ক্ষুধা সূচক তৈরিতে কাজে লাগানো হয়েছে।

কতটা ভয়াবহ এই পরিস্থিতি? সরকারি-বেসরকারি সমীক্ষা বলছে রেশনে চালগম

দুয়ের পাতায় দেখুন

সমাজতন্ত্র যা দিতে পারে পুঁজিবাদ তা পারে না

নভেম্বর বিপ্লবের ১০৫তম বার্ষিকী

১৯১৭ সালের ৭-১৭ নভেম্বর পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় উদ্ভব ঘটেছিল এক নতুন সভ্যতার। এই নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় নভেম্বর মাসে ঘটেছিল বলে ইতিহাসে তা নভেম্বর বিপ্লব নামে পরিচিত। আগামী ৭ নভেম্বর ১০৫তম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী। এই বিপ্লব সামন্তীবাদের অবশেষ এবং পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে কায়েম করেছিল শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা ‘সমাজতন্ত্র’। সেই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, না এলে এ জন্মের তীর্থ দর্শন অসমাপ্ত থাকত। এই সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আইনস্টাইন, বার্নাড শ, রমাঁ রলাঁ, চ্যাপলিন, শরৎচন্দ্র, নেতাজি, নজরুল সহ অসংখ্য মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব। সমাজতন্ত্রের কী মহত্ত্ব দেখে তাঁরা আপ্লুত হয়েছিলেন? সমাজতন্ত্র কী দিয়েছিল রাশিয়াকে? এক কথায়, সমাজতন্ত্র মানুষকে দিয়েছিল সমস্ত রকমের শোষণ, বঞ্চনা, বন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ।

রাশিয়ায় জারের শাসনে যে সমস্ত সমস্যায় মানুষের জীবন ছিল জেরবার, সমাজতন্ত্র তা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে সমস্ত সমস্যায় মানুষের জীবন নিষ্পেষিত তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ এই সমাজতন্ত্র সেই কারণে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদীরা তীব্র সমালোচনায় মুখর। শোষণের সওদাগরদের বিষোদ্গার সত্ত্বেও মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে সমাজতন্ত্রের আবেদন বিশ্বজনীন। এমনকী সমাজতন্ত্রের সাময়িক পরাজয় সত্ত্বেও এর অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক রূপরেখা জানলে এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ তৈরি হয় দুর্নিবার। কোথায় তার রহস্য?

পাঁচের পাতায় দেখুন

গুজরাটে ব্রিজ ভেঙে বিপুল প্রাণহানি
রাজ্য জুড়ে শোকদিবস

গুজরাটের মোরবি শহরে ৩০ অক্টোবর একটি ফুটব্রিজ ভেঙে পড়ায় বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর গুজরাট রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে পরদিন আমেদাবাদ, সুরাট এবং বরোদা শহরে বেদি নির্মাণ করে শোক ব্যক্ত করা হয়। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়ে দ্রুত তদন্ত করে অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবি করা হয়। এই দাবিতে রাজ্যব্যাপী প্রচার আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলের গুজরাট রাজ্য কমিটি।
ছবি ঃ আমেদাবাদে শোকবেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী যোশী।

পুদুচেরিতে বিদ্যুৎক্ষেত্র বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পুদুচেরির পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগের পুরোপুরি বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিষয়ে নিলামের জন্য ২৭ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার ধর্মঘটে নামে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারী ও ইঞ্জিনিয়াররা, তাঁদের সাথে যোগ দেয় সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকরা।

লাগাতার ধর্মঘটের ফলে পুদুচেরির সর্বত্র নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার। বিদ্যুৎ গ্রাহকরা দলমত নির্বিশেষে বহু জায়গায় বেসরকারিকরণ বিরোধী এই আন্দোলনের সমর্থনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। আন্দোলনের চাপে ৩ অক্টোবর কেন্দ্রশাসিত পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেছেন, বেসরকারিকরণের এই সিদ্ধান্ত একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে এবং কর্মচারীদের স্বার্থবিরোধী।

অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সমর সিনহা বলেন, বেসরকারিকরণের ফলে গ্রাহকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে, বিদ্যুতের দাম লাগামছাড়া হবে। তিনি এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান মঞ্চে এ আই ইউ টি ইউ সি

এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, শান্তি ঘোষ, বঙ্কিম চন্দ্র বেরা ও শ্যামল রামের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ২৮ অক্টোবর কলকাতায় গান্ধী মূর্তি ও মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে অবস্থানকারী পাশ করে চাকরি না পাওয়া প্রার্থীদের ৭টি অবস্থান মঞ্চে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা করেন। রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস তাঁদের সকলের কাছে আহ্বান জানান, সরকার দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

তিনি আরও বলেন, এই ৭টি অবস্থান মঞ্চের মুখপাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে আহ্বান জানিয়ে একটি বিশাল নাগরিক মিছিলের কর্মসূচি নিন। এই মিছিলে দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে আহ্বান জানান। আমরা এই কর্মসূচিকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করব।

অন্ধকার ঢাকা যায় না

একের পাতার পর

বিনামূল্যে পাওয়ার পরেও গ্রামে এবং শহরে বিরাট অংশের পরিবার এমনকি তাদের শিশুদের পর্যন্ত পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কথা ভাবতেই পারছে না। এ দেশে এত বিকাশ হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারকেই মাত্র দু'বছর আগে বলতে হয়েছে ৮০ কোটি মানুষের জন্য বিনামূল্যে খাদ্যশস্য প্রয়োজন। ১৯.৩ শতাংশ শিশু কম ওজন এবং উচ্চতার সমস্যায় ভুগছে। ২২ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি মানুষ দুবেলা পেটভরে খাবার পান না। ৫ বছরের কম বয়সী ৭ কোটির বেশি শিশু এবং সন্তানসম্ভবা মায়েরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে যতটুকু পুষ্টি পেতেন তাতেও ঘাটতি চলছে দীর্ঘ সময়। স্কুলে মিড ডে মিলে সরকারের বরাদ্দ প্রাথমিকে শিশুপ্রতি ৫ টাকারও কম এবং উচ্চ প্রাথমিকে প্রায় ৮ টাকা। এতে পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরের কথা পেটভরা খাবার দেওয়াই সমস্যার।

দেশের মাটির সাথে ন্যূনতম যোগ থাকলে কি এই সব তথ্য কেউ অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু বিজেপি সরকার গায়ের জোরে সেটাই করছে। তাঁরা যত বিকাশ, আত্মনির্ভরতার কথা বলেছেন, ততই মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের সিন্দুক উপচে পড়েছে অন্য দিকে অধিকাংশ জনগণ সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। অতিমারিজনিত লকডাউনের মধ্যে ভারতে নতুন করে ৪০ জন ধনকুবেরের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিমালিক গৌতম আদানি বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী হওয়ার গর্বে ভারত সরকারের বুক ফুলে উঠছে। অন্য দিকে গ্রাম শহরের প্রতিটি সাধারণ পরিবারে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেছে। কমেছে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট, অর্থাৎ আগে যত লোক কাজের বাজারে এসে কাজ পেতেন তার সংখ্যা ক্রমাগত কমেছে। দেশের কর্মক্ষম মানুষের ৫১ শতাংশের বেশির কোনও রোজগার নেই। এদিকে খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে রকেট গতিতে, বেড়েছে জ্বালানির দাম, পরিবহণ ভাড়া ইত্যাদি সব খরচই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি বিভাগই গম, চাল, ডাল ও তৈলবীজের বিপুল দামবৃদ্ধির কথা স্বীকার করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্পে রেশনে গম সরবরাহ বন্ধ করেছে উৎপাদনে ঘাটতির কারণ দেখিয়ে। তারাই গম-চালের বাড়তি দামের অজুহাতে মিলেট জাতীয় খাদ্যশস্যের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সওয়াল করছে।

একই সাথে বেসরকারি সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে যেখানে সবচেয়ে বেশি মানুষ কাজ করেন, তাতে প্রকৃত বেতন কমেছে। সাবান, শ্যাম্পুর সবচেয়ে ছোট প্যাকের মতো একেবারে অতিসাধারণ ভোগ্যপণ্যের বিক্রিও গ্রামে এমনকি শহরাঞ্চলেও কমছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন কলকারখানা খোলা দূরে থাক চালু সংস্থা বন্ধ হচ্ছে। ২০১৯ সালে সরকার সংসদে জানিয়েছিল দেশে রেজিস্টার্ড কোম্পানির ৩৬ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৬ লক্ষ ৮০ হাজার বন্ধ হয়ে গেছে (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ১৯.০৭.২০১৯)। ২০২১-এ সরকার জানিয়েছে ৭ লক্ষ নতুন কোম্পানি রেজিস্টার্ড হয়েছে গত ৬ বছরে (ইকনমিক টাইমস ২০.১১.২০২১)। যদিও এই সমস্ত কোম্পানির অনেকগুলিই শুধু খাতা কলমে থাকা কোম্পানি, বাস্তবে অস্তিত্ব নেই। সরকারের হিসাব মেনে নিলেও দেখা যাচ্ছে যত সংস্থা বন্ধ হয়েছে তার ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়। লে-অফ, অর্ধেক উৎপাদন, শ্রমিকদের সপ্তাহে দু-তিনদিন কাজ দিয়ে খুঁড়িয়ে চলছে আরও অসংখ্য কারখানা। এই সমস্ত কলকারখানার শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের খাদ্য, পুষ্টি কোথা থেকে আসবে? কেন্দ্রীয় সরকার এ নিয়ে চিন্তা করবে কি, তারা বরং রেশনে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ থেকে হাত গুটিয়ে ফেলতে বেশি আগ্রহী। নরেন্দ্র মোদি বিশ্বের ত্রাতা বলে তাঁর দলের প্রচারের শেষ নেই। সেই ভারতেই বাড়ছে অর্ধভুক্ত মানুষের সংখ্যা। এ দেশটা আসলে কাদের, মুষ্টিমেয় ধনকুবের, না ৯৯ শতাংশ খেটে খাওয়া মানুষের?

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত রঘুনাথপুর গ্রামীণ লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য, বিশিষ্ট সংগঠক এবং শিক্ষা তথা শিক্ষক আন্দোলনের নেতা কমরেড জগদীশ মাজীর জীবনাবসান হয় ২৪ সেপ্টেম্বর। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে তাঁর যৌবনকালে কমরেড জগদীশ মাজী তাঁরই গ্রাম সেনেড়ার প্রবীণ জননেতা প্রয়াত কমরেড অমর ঘোষালের মাধ্যমে দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং কাজ শুরু করেন।

তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে তিনি স্থানীয়, জেলা ও রাজ্যের বহু আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং ক্রমে দলের লোকাল কমিটির সম্পাদকের পদে থেকে কৃষিমজুর, গ্রামীণ মজুরদের সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও সমিতিতে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলেন। রঘুনাথপুর ব্লক অফিসে পানীয় জল ও খরা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশি অত্যাচারের সম্মুখীন হন এবং ৩৬ জন পার্টিকর্মীর সাথে কারাবরণ করেন।

'৮০র দশকে পূর্বতন সরকারের জনবিরোধী ভাষা শিক্ষানীতি, ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে একটানা ১৯ বছর ধরে চলা আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি এলাকায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। হাইস্কুলের শিক্ষাকর্মী হওয়ায় তিনি শিক্ষক সংগঠন এসটিইএ-র সাথে যুক্ত থেকে শিক্ষা তথা শিক্ষক আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন।

কমরেড জগদীশ মাজী একদিকে ছিলেন যেমন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ, দলের জুনিয়র কর্মীদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, অপরদিকে ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে দলের দেওয়া দায়িত্ব তিনি যেমন নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন আবার দায়িত্ব পালনে কেউ অমনোযোগী হলে তিনি নেতা-কর্মী নির্বিশেষে বিদ্বেষমুক্ত মন নিয়ে খোলাখুলি ভাবে কঠোর সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। প্রতিটি নেতা-কর্মীর জন্য তাঁর বাড়ির দরজা ছিল সবসময় খোলা। তাঁর প্রচেষ্টাতেই আজ পরিবারের সকলেই দলের সাথে যুক্ত।

শ্বাসকষ্টজনিত দীর্ঘ রোগভোগের পর একটু সুস্থবোধ করতেই তিনি নেতৃত্বের কাছে দলের কাজে পূর্ণ সময় দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং গত প্রায় একবছর তিনি আশেপাশের গ্রামগঞ্জে ঘুরে দলের সমর্থকদের সাথে মিলিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছিলেন। দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে গড়ে ওঠা স্থানীয় কর্মসূচিগুলিতে সক্রিয় অংশ নিচ্ছিলেন। সম্প্রতি পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার অফিসঘর নির্মাণে তাঁর পক্ষ থেকে যতটা বেশি আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া যায়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টা জারি রেখেছিলেন। রোগশয্যায় থাকা অবস্থাতেও তিনি গ্রাহক ও পাঠকদের কাছে নিয়মিত দলের মুখপত্র গণদাবী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

কমরেড জগদীশ মাজীর মৃত্যুতে দলের স্থানীয় সংগঠনের অপূরণীয় ক্ষতি হল। দল হারাল একজন সংগ্রামী নেতা ও দক্ষ সংগঠককে।

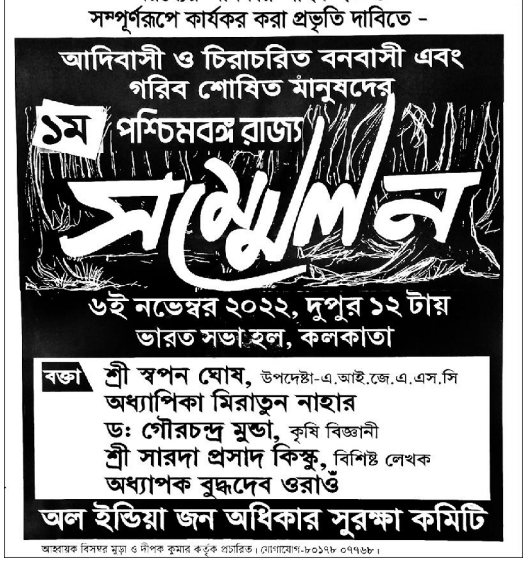

১৬ অক্টোবর সেনেড়া হাইস্কুলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত আবেগের সাথে এলাকার বিশিষ্টজন সহ দলের কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথপুর গ্রামীণ লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড শিবরাম সরেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জি। বক্তব্য রাখেন পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা।

কমরেড জগদীশ মাজী লাল সেলাম

অপরাধীদের নির্দোষ দেখাতে বিজেপি নেতাদের নির্লজ্জ মিথ্যাচার

বিলকিস বানো

২০০২-এর গুজরাট গণহত্যার সময়ে বিলকিস বানোকে গণধর্ষণ ও তাঁর পরিবারের ৭ জনকে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ১১ জন বিজেপি কর্মীকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গুজরাটের বিজেপি সরকার মুক্তি দিয়েছে। এই ধরনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে আমৃত্যু কারাদণ্ড। তা সত্ত্বেও গুজরাট সরকার এই অপরাধীদের মুক্তি দিল কী করে?

গুজরাট সরকার যুক্তি দিয়েছিল, কারাবাসের সময়ে এই অপরাধীরা অত্যন্ত ভাল আচরণ করায় তাদের সাজার মেয়াদ সরকারি নিয়মেই কমে গেছে। তাই তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং তা দেওয়া হয়েছে এই সংক্রান্ত আইন মেনেই। অবশ্য গুজরাটের এক বিজেপি নেতা এই মুক্তি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এঁরা সংস্কারী ব্রাহ্মণ। এমন অপরাধ এঁরা করতেই পারেন না।

ধর্ষক-খুনীদের এই মুক্তি সারা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়। তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় দেশ জুড়ে। এই মুক্তি রদ করার দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হলে কোর্ট গুজরাট সরকারকে হলফনামা পেশের নির্দেশ দেয়। সেই হলফনামাতে অপরাধীদের সদাচরণের যে নমুনা বেরিয়ে এসেছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকার অপরাধীদের মুক্তি দিতে কত বড় মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে, এতে তা-ও স্পষ্ট হয়ে গেছে।

গুজরাট সরকারের হলফনামা কী বলছে? এই ১১ জন অপরাধী যখন প্যারোলে জেলের বাইরে ছিল, তখন এদের মধ্যে দু'জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। দু'জনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জমা পড়েছে। ১১ জনের মধ্যে ১০ জনই প্যারোলের নিয়ম ভঙ্গ করেছে। নিয়মভঙ্গের জন্য বেশ কয়েক জন জেলে শাস্তিও পেয়েছে। অপরাধীদের ১৪ বছরের বেশি জেলে থাকার কথা গুজরাট সরকার বললেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, তারা প্রায় সকলেই প্যারোলে হাজার দিনের বেশি জেলের বাইরে থাকার সুযোগ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, ১১ জনের মধ্যে ১০ জনই প্যারোলের নিয়ম ভঙ্গ করে নির্দিষ্ট দিনের চেয়ে অনেক দেরিতে জেলে ফিরেছে। দীর্ঘ সময়ের সাজাপ্রাপ্তরা জেলে সদাচরণের বিনিময়ে মুক্তি এগিয়ে আনার যে সুবিধা পেয়ে থাকেন, যাকে আর্নড রেমিশন বলা হয়, নিয়ম অনুযায়ী এদের প্রায় সকলেরই তা হারানোর কথা। তার বদলে গুজরাটের বিজেপি সরকার এদের সদাচরণের সার্টিফিকেট দিল! এ থেকে এটাই স্পষ্ট যে, গুজরাট সরকারের যুক্তি ছিল আসলে অজুহাত মাত্র।

১৯৯২-এর যে আইনে সুপ্রিম কোর্ট দণ্ডিতদের পূর্বমুক্তির কথা বিবেচনা করতে বলেছিল, তাতে যে শর্তগুলি দেওয়া হয়েছিল সেগুলিকে সরকার অগ্রাহ্য করেছে। যেমন, অপরাধীদের মুক্তি দিলে সমাজে তার কী প্রভাব পড়বে, তা খতিয়ে দেখা। প্যারোলে থাকাকালে তাদের অপরাধের তালিকাই প্রমাণ করেছে এই মুক্তি সমাজের পক্ষে কতখানি মারাত্মক হতে চলেছে। তা ছাড়া, যে আদালত তাদের শাস্তি দিয়েছে, সেই আদালতের মত নেওয়ার নির্দেশ ছিল। সেই নিম্ন আদালত, সিবিআই, এমনকি পুলিশও কিন্তু অপরাধীদের মুক্তি দেওয়ার বিরুদ্ধেই মত দিয়েছিল।

অর্থাৎ এদের মুক্তি দিতে গিয়ে গুজরাট সরকার কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কেউই কোনও নিয়ম, আইন কোনও কিছুরই তোয়াক্কা করেনি। আসলে অপরাধীরা যেহেতু বিজেপির পরিকল্পিত গুজরাট গণহত্যায় খুনি, ধর্ষণকারীর ভূমিকা পালন করেছে, তাই বিজেপি সরকার তথা নেতাদের চোখে তাদের কোনও অপরাধই প্রকৃত অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। তাই তাদের মুক্তির জন্য কোনও নিয়ম মানার, আইন মানার প্রয়োজন বিজেপি নেতারা মনে করেননি।

অনেকেরই মনে আছে, এ বছর স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে সব জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে মহিলাদের মর্যাদা, সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল কথা ছিল। বলেছিলেন, আমাদের মহিলাদের অপমান করার মানসিকতা পরিত্যাগের সঙ্কল্প নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনতে শুনতেই কোনও মহিলা যদি দেখেন গর্ভবতী অবস্থায় তাঁর উপর দলবদ্ধ ধর্ষণকারীদের সরকার সেদিনই কারাবাসের মাঝপথে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছে, তবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা এবং এই ঘটনাকে কী ভাবে মেলাবেন তিনি? এই ঘটনাকে কি তিনি তাঁর তথা মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন হিসাবে দেখতে পারবেন? স্বাভাবিক ভাবেই বিলকিস বানো তা পারেননি।

একই ভাবে পারেননি দেশের বিরাট অংশের মহিলারাও। তাঁরা এই মুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং এক বাক্যে প্রশ্ন করেছেন, এই কি প্রধানমন্ত্রীর মহিলাদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের নিদর্শন? নাকি বক্তৃতার সবটিই এমন শূন্যগর্ভ কথার ফুলঝুরি মাত্র? কারও মনে হতে পারে, গুজরাটে অপরাধীদের এই মুক্তির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মহিলাদের সম্মান প্রদর্শনের সদিচ্ছার বিরোধ কোথায়? অবশ্যই আছে। কারণ গুজরাট সরকারের এই কর্মকাণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সম্মতির প্রয়োজন এবং সে সম্মতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এ কথা ঠিক যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কিন্তু গুজরাট গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত এই বিলকিস বানো ধর্ষণ মামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ঘটনা। সেই মামলায় দোষী ১১ জন অপরাধীর সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তা-ও ঠিক গুজরাট নির্বাচনের আগে, অথচ প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ছাড়াই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তা করছেন, এমন ঘটনা প্রধানমন্ত্রীর দলের লোকেরাই বিশ্বাস করবেন না। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা এবং বাস্তব আচরণের এই বৈপরীত্য দেশবাসী কোন দৃষ্টিতে দেখবে!

প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হোন, এঁরা সকলেই জনগণের ভোটে নির্বাচিত মন্ত্রী। এঁরা প্রত্যেকে ভারতের সংবিধান মেনে শাসন চালানোর অঙ্গীকার করেছেন। সেই অঙ্গীকার যদি তারা

সাতের পাতায় দেখুন

বন্যাদুর্গতদের ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছে যোগী সরকার

বললেন দলেরই সাংসদ

যে কোনও সৎ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ মাত্রই বলে থাকেন, আর্ত, অসহায় মানুষকে সেবা করার অর্থ ভগবানের সেবা করা। মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াবে মানুষ, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মের জিগির তুলে যারা রাজনীতি করে থাকেন, সেই বিজেপি নেতারা মানুষের অসহায়তাকে আদৌ অনুভব করেন কিনা, উত্তরপ্রদেশে বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের দুর্দশা দেখে সে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ বিজেপিরই এক সাংসদ।

উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নাকি তাঁর রাজ্যের হাল ফিরিয়ে দিয়েছেন! তাঁর শাসনকালে উত্তরপ্রদেশের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে বলে দাবি তাঁর ও তাঁর দলের। উন্নয়নের কাজে কোনওরকম সরকারি গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলে মাঝে মাঝেই হুঙ্কার দেন মুখ্যমন্ত্রী। অথচ ভয়ঙ্কর বন্যায় রাজ্যের বিরাট অংশের মানুষ যখন বিধ্বস্ত, তখন কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়াবার কথা মনে হয়নি তাঁর।

গত আগস্ট মাসের শেষ থেকে ভয়াবহ বন্যায় উত্তরপ্রদেশের ২২টি জেলার ১৬৬৭টি গ্রাম পুরোপুরি প্লাবিত। বহু এলাকা এখনও জলমগ্ন। সরকারি হিসাবেই ১৩ লক্ষ ৫১ হাজারের বেশি মানুষ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বেশ কয়েক জন মারা গিয়েছেন। একটানা বৃষ্টিপাত এবং বহু নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ার পরিণতিতে এই বিপত্তি। গঙ্গা, যমুনা, রাপ্তি, সরযূ, রামগঙ্গা, শারদা, ঘাগরা, বুদ্ধ রাপ্তি, কুনহারা, কুওয়ানো প্রভৃতি নদীগুলি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বন্যার প্রকোপে কয়েক লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। খাদ্য, পানীয় জল এবং আশ্রয়ের অভাবে মানুষ অসহায় অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। রাজ্যের বিজেপি সরকার এই ভয়াবহ বন্যার মোকাবিলা করেছে কিছু স্পিডবোট আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের কয়েক জন কর্মী দিয়ে। বিধ্বংসী বন্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় জলযান, ফ্লাড সেন্টার, খাবার-ওষুধ-পানীয় জল সহ ত্রাণসামগ্রী নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের বন্যাদুর্গত মানুষদের কাছে দ্রুত পৌঁছনো দরকার ছিল, তা চূড়ান্ত অবহেলিত হয়েছে। নেতা-মন্ত্রীদের ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সরাসরি তদারকি করা জরুরি ছিল। কিন্তু তাঁরা ঠাণ্ডা ঘরে বসে কিছু শুকনো বিবৃতি দিয়ে অথবা উদ্ধারকারী দলকে নির্দেশ দিয়েই কর্তব্য পালন করেছেন। অথচ ভোটের সময় এই নেতা-মন্ত্রীদেরই প্রতিশ্রুতির উপচে পড়া ডালি নিয়ে দু'বেলা দেখতে বাধ্য হন সাধারণ মানুষ। সেই সময় হাজার হাজার কোটি টাকা ছড়াতেও তাদের কোনও অসুবিধা হয় না। স্বভাবতই, প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বন্যাবিধ্বস্ত মানুষ।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হেলিকপ্টারে চড়ে বন্যাপ্লাবিত কিছু এলাকা পরিদর্শন করেই দায়িত্ব সেরেছেন। তিনি এই ভয়াবহ অবস্থার জন্য পার্শ্ববর্তী মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান সরকারকে দায়ী করেছেন ড্যাম থেকে জল ছাড়ার জন্য। যখন একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপে মেতে রয়েছেন নেতারা, সাধারণ মানুষ প্রকৃতির রোষের মুখে পড়ে রয়েছে অসহায় অবস্থায়। অবস্থা এমনই অসহনীয় যে, বিজেপিরই সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং যোগী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন— রাজ্য সরকার বন্যাবিধ্বস্ত মানুষদের 'ঈশ্বরের ভরসায়' ছেড়ে দিয়েছে। নিজের কেন্দ্র কাইসারগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করে তিনি বলেন, 'বন্যা মোকাবিলা ও ত্রাণের ক্ষেত্রে এমন অব্যবস্থা আগে দেখিনি।' সরযূ নদীর উপরে সেতু ভেঙে পড়ার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি দায়ী করেছেন।

বন্যা মোকাবিলায় বিজেপি সরকারের এত অবহেলা কেন? সরকারের, প্রশাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তরের অভাব রয়েছে, লোকবল নেই, নাকি অর্থের অভাব? সব কিছুই রয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকারের এই দুর্বৃত্তসুলভ আচরণ, ক্ষমার অযোগ্য অবহেলার কারণ দলটির নীতিহীন রাজনীতি। মানুষের প্রতি দরদবোধের বদলে তাদের অভিধানে রয়েছে মানুষে-মানুষে ঘৃণা ছড়ানোর পাঠ, একের বিরুদ্ধে অপরের মধ্যে বিভেদের বীজ পুঁতে দেওয়ার পাঠ। তাই সাধারণ মানুষের প্রাণের মূল্য নেই তাদের কাছে। মানুষ যে তাদের কাছে শুধুই ভোটার তা সাম্প্রতিক বন্যায় আবার প্রমাণিত হল।

অথচ এমন বিধ্বংসী বন্যা মোকাবিলায় শাসক দলেরই সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা দরকার ছিল। পুলিশ-প্যারা মিলিটারি নামিয়ে, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে দিয়ে অসহায় অবস্থা থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করা— জনদরদের ছিটেফোঁটাও সরকারি কর্তাদের না থাকায় তা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রকৃতির হাতে ছেড়ে না দিয়ে অত্যাধুনিক নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এবং নদীর জলস্তর বিপদসীমার উপরে যাওয়ার সাথে সাথেই মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে আরও অনেক প্রাণ বাঁচানো যেত, সম্পত্তি রক্ষা পেত। সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ হিসাবে নদীর ধারে বেআইনি নির্মাণ, নদীর বুকে অবৈধভাবে খনন, নদীর প্রবাহপথকে ব্যবসায়িক স্বার্থে অন্যত্র সরানো বন্ধ করতে পারত এবং বৃক্ষরোপণ ও নদীবাঁধ পোক্ত করতে পারত সরকার। এগুলির কোনওটাই কার্যকর করেনি যোগী সরকার। প্রশ্ন উঠছে, একমাত্র মন্দির-মসজিদ বিবাদ জিইয়ে রাখতেই কি পারদর্শী রাজ্যের বিজেপি সরকার?

২ কোটির বদলে ১০ লক্ষ, ১০ লক্ষের বদলে ৭৫ হাজার

প্রধানমন্ত্রী, প্রতিশ্রুতি আর কত বদলাবেন!

২২ অক্টোবর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ‘রোজগার মেলা’ কর্মসূচি থেকে ৭৫ হাজার চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে ক’মাস আগে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২০২৪-এর আগে আমরা ১০ লক্ষ চাকরি দেব। বছরে ২ কোটি বেকারের কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মোদিজি হঠাৎ ১০ লক্ষ চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করলেন কেন? কেনই বা ১০ লক্ষের মধ্যে মাত্র ৭৫ হাজার? অর্থাৎ একটা প্রতিশ্রুতিকে ভোলাতে আর একটা প্রতিশ্রুতি! তিনি কী ভাবছেন, দেশের মানুষ তাঁর আগের প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়েছেন? না। তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি দেশের মানুষ ঠিকই মনে রেখেছেন। আর সত্যিই যদি তিনি চাকরি দিতে চান, তবে রোজগার মেলা করার দরকার কীসের? সরকারি দপ্তর থেকেই তো তা দেওয়া যায়। নাকি তাহলে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বেকার যুবকদের সঙ্গে হাসি হাসি মুখে ছবি তুলে দেশবাসীকে দেখানো যায় না যে, সরকার বেকার যুবকদের কথা কত ভাবে!

তিনি বলেছেন, এক শতাব্দীর কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান ১০০ দিনের মধ্যে করা সম্ভব নয়। কেউ কি প্রধানমন্ত্রীকে ১০০ দিনের মধ্যে সব বেকারকে চাকরি দেওয়ার কথা বলেছেন? ১০০ দিন কেন, ৮ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও তাঁর সরকার কর্মসংস্থানের ন্যূনতম ব্যবস্থা করতে পারল না কেন? কেন তাঁদের শাসনে বেকারত্ব ৪৫ বছরের মধ্যে শীর্ষে পৌঁছল?

এখনই বা হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থানের ঘোষণা কেন? সামনে গুজরাট, হিমাচলপ্রদেশ মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, হরিয়ানায় উপনির্বাচন এবং পুরভোট বলেই তো! ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচন। অত্যন্ত চড়া মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দারিদ্রে জেরবার মানুষ বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিয়েও সর্বত্র কাজ হাসিল হচ্ছে না। ‘আচ্ছে দিনের’ স্বপ্ন ফেরি করা বিজেপি নেতাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে জনরোষের দুঃস্বপ্ন। চাকরি দেওয়ার ভাঁওতাবাজিতে আর ভোলানো যাচ্ছে না দেশের যুব সমাজকে। ক্ষোভের প্রতিফলন যাতে ভোটবাক্সে না পড়ে সেজন্য যুব সমাজের সামনে এই প্রতিশ্রুতির গাজর ঝুলিয়ে রাখা প্রধানমন্ত্রীর।

অতিমারি ও তার পরবর্তী অনিশ্চয়তার কারণে বেকারত্বের বাড়বাড়ন্ত বলে জানিয়েছে সরকার। কথাটি আংশিক সত্য। সরকারি তথ্য থেকেই তো দেখা যাচ্ছে, শুধু কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরেই প্রায় ১০ লক্ষ পদ শূন্য। স্কুল-কলেজ সহ নানা ক্ষেত্রের দপ্তরগুলিতেও ফাঁকা পড়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ পদ। কর্মসংস্থানের সদিচ্ছা থাকলে প্রধানমন্ত্রী তো সেগুলি অন্তত পূরণ করতে পারতেন! সেটুকুও না করে ভোটের মুখে মানুষের ক্ষোভ এড়াতে একের পর এক ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলা হয়ে দাঁড়িয়েছে নেতা-মন্ত্রীদের কাজ। শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও ভুয়ো নিয়োগপত্র বিলি করে প্রতারণা করে চলেছেন বেকার যুবকদের সাথে। আসলে দেশজুড়ে বেকার যুবকদের যন্ত্রণার প্রতি, কি কেন্দ্র, কি রাজ্য—কোনও সরকারের কোনও কর্তারই বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। ভোট সামনে এলেই শুধু তাদের কথা মনে পড়ে নেতাদের এবং বন্যা বইতে থাকে চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতির।

বাঁকুড়ার কোতুলপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

ত্রুটিপূর্ণ মিটার দ্রুত পাল্টানো, স্মার্ট প্রিপেড মিটার ও ভুতুড়ে বিল বাতিল, বিদ্যুৎ সংযোগ দ্রুত করা, বোরো চাষের সময়ে লাইন কাটা বন্ধ ও বিদ্যুৎ বিল-২০২২ বাতিল প্রভৃতি দাবিতে কোতুলপুর ষষ্ঠ বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৩০ অক্টোবর। ব্লকের প্রত্যন্ত ৮টি ফিডার থেকে তিন শতাধিক গৃহস্থ গ্রাহক, কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক গ্রাহক কোতুলপুর নেতাজি মোড় থেকে মিছিল করে সম্মেলন স্থল আলু ব্যবসায়ী সমিতি হলে উপস্থিত হন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তারাপদ গরাই। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কোতুলপুর ব্লক কমিটির সম্পাদক গোবিন্দ ঘোষ। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কল্যাণ বসু, নিমাই দে, হরশঙ্কর কর্মকার, মজফফর মেদ্দা, জেলা কমিটির সম্পাদক স্বপন নাগ ও প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিদ্যাভূষণ দে। বক্তারা গ্রাহকদের নানা সমস্যা তুলে ধরেন এবং রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের গ্রাহক বিরোধী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। সভা থেকে গোবিন্দ ঘোষকে সম্পাদক ও তারাপদ গরাইকে সভাপতি করে ৪১ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়। নব নির্বাচিত কমিটির দায়িত্ব, কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ দাস।

সারা ভারতে দলের আন্দোলনের খবর পেতে এসইউসিআই(সি)-র অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ফলো করুন

পিসিএআই-এর কর্মশালা

এ দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় ১৯-২১ অক্টোবর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুশীলন কেন্দ্রে দু’দিনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত-নাটক-আবৃত্তির কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুই শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন।

১৯ অক্টোবর মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ওই দিন দলের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রতাপ সামলের উদ্বোধনী ভাষণের পর বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে সঙ্গীত-নাটক-আবৃত্তি-নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে কর্মশালার কাজ শুরু করেন।

২১ অক্টোবর সকালে সঙ্গীত-নাটক-আবৃত্তি-নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সূচিত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে মূল বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রতাপ শামল প্রমুখ। স্বপ্ন ও সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে দীপ্তোজ্জ্বল মুখে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আগামী দিনের বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে প্রতিনিধিরা ফিরে যান।

দেদার মুনাফা সত্ত্বেও বেতন বৃদ্ধিতে রাজি নয় মালিকরা

ফ্রান্স জুড়ে ধর্মঘট, বিক্ষোভ-মিছিলে প্রতিবাদী শ্রমিক-কর্মচারীরা

বেতনবৃদ্ধির দাবিতে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন ‘জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবার’ (সিজিটি)-র ডাকে ১৮ অক্টোবর ফ্রান্স জুড়ে ধর্মঘট পালন করলেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শহরে শহরে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হলেন সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত হাজার হাজারে মানুষ। লাল পতাকায় সেজে উঠল রাজপথ। দু’দিন আগে ১৬ অক্টোবর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ। ১৮ তারিখ সেই আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতায় দেশ স্তব্ধ করে দিলেন বিক্ষোভকারীরা।

“গোটা ইউরোপ একদিকে মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়ছে। অন্যদিকে আকাশছোঁয়া মুনাফা লুটছে বড় বড় শিল্পপতিরা। কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কথা উঠলেই মালিকরা বলছে, টাকা নেই। ইউরোপের সর্বত্র তাই ক্ষোভে ফুঁসছে শ্রমিক-কর্মচারীরা”— বললেন ফিলিপ্পে মার্তিনেজ, সিজিটি-র সাধারণ সম্পাদক। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে তেল ও গ্যাসের দাম অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় বিপুল মুনাফা লুটছে ফ্রান্সের তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলি।

এদিকে খেটে-খাওয়া মানুষ মূল্যবৃদ্ধির চাপে জেরবার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় পরিমাণে বেতন বাড়াতে রাজি হচ্ছেন না কোম্পানি-মালিকরা। কয়েকমাস আগে দ্বিতীয়বারের জন্য সরকারি পদে বসেছেন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ। কিন্তু দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের দুর্দশা ঘোচাতে তাঁর সরকারের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

ঠিক একই অবস্থা ভারতের শ্রমিকদেরও। বৃহৎ পুঁজির মালিক কয়েকজনের মুনাফা যখন আকাশ ছুঁচ্ছে, তখন সামান্য মজুরিতে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন দেশের বিপুল সংখ্যক মেহনতি মানুষ। সরকার নির্বিকার। গরিবি, বেকারিতে জেরবার মানুষের ক্ষোভ প্রতিদিন ফেটে পড়ছে দেশের এখানে-ওখানে।

প্রবল ক্ষোভ ফ্রান্সের শ্রমিকদের বুকেও। শ্রমিক সংগঠন সিজিটি-র নেতৃত্বে ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে তাই জোরদার আন্দোলনে নেমেছেন সেখানকার শ্রমিক-কর্মচারীরা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ফ্রান্সের তৈল শোধনাগারগুলির কর্মীরা বেতনবৃদ্ধির দাবিতে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। যার প্রভাব পড়েছে গোটা দেশে। তাঁদেরই ডাকে সাড়া দিয়ে রেল ও অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থার কর্মচারী, ট্রাক ও বাস কোম্পানির শ্রমিক, হাইস্কুলের শিক্ষক, সরকারি হাসপাতালের কর্মীরা সহ ফ্রান্সের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ এ দিনের ধর্মঘটে সামিল হন।

দেশ জুড়ে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ হামলা চালায়। গ্রেফতার হন অনেকে। আহত বেশ কিছু জন।

সমাজতন্ত্র যা দিতে পারে, পুঁজিবাদ তা পারে না

একের পাতার পর

সমাজতন্ত্র বেকারত্বের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটিয়েছিল

ভারতের মতো পুঁজিবাদী দেশে চাকরি চাই, কাজ চাই, কাজের সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই ইত্যাদি দাবিতে যুবকদের আন্দোলন করতে হয়, রাজপথে দিনের পর দিন ধরনা দিতে হয়। সরকার সেই আন্দোলনে লাঠি-গুলি চালিয়ে জবাব দেয়। এই পুঁজিবাদী সমাজে সরকার সকলের চাকরির ব্যবস্থা করা দূরের কথা, কাজের সাংবিধানিক অধিকারটুকুও দিতে রাজি নয়। চাকরির এই চূড়ান্ত সংকটের জন্যই যুবকদের একাংশ অন্যায়ভাবে কাজ পাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। অনৈতিক পথে তাদের যেতে হয়। সমাজতন্ত্রে এ সবের বালাই নেই। নভেম্বর বিপ্লবের পর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সরকার ঘোষণা করেছিল, সবাইকে সাধ্যানুযায়ী কাজ করতে হবে এবং উপযুক্ত কাজ দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। কী ভাবে সমাজতন্ত্র এ কাজ সম্ভব করতে পেরেছিল? পেরেছিল উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুনাফার চক্কর থেকে মুক্ত করে।

পুঁজিবাদে উৎপাদন হয় মানুষের প্রয়োজনকে ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য। কিন্তু সমাজতন্ত্রে উৎপাদন হয় মানুষের বা সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। সমাজের যে সামগ্রিক প্রয়োজন তা হিসাব করে পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন করা হয় এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জিনিসপত্রের দাম ধার্য করা হয়। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকের শ্রমের ফলে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তার একটা অংশ দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও শিল্পোন্নয়নে নিয়োগ করা হয়। বাকি সবটাই মজুরের প্রাপ্য হিসাবে ফিরে আসে। এতে মজুরের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। তাকে ভিত্তি করে ক্রমাগত শিল্পায়ন হয়। নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে মুনাফা করতে গিয়ে শিল্পায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

পুঁজিপতিরা কী ভাবে মুনাফা করে? নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন 'গ্রামের গরিবদের প্রতি' আলোচনায় দেখান— উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা আসে মূলত চারটি উপায়ে, (১) কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে, (২) উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে, (৩) কাজের সময় বাড়িয়ে, (৪) মজুরির পরিমাণ কমিয়ে। কিন্তু অর্থনীতিতে এর ফল কী বর্তায়? এর ফলে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতার অবনমন ঘটে, বাজারে মন্দা দেখা দেয়, শিল্পায়নের গতি শ্লথ হয়, বেকারত্ব বাড়ে, শ্রমিক ছাঁটাই হয়। এগুলি পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য পরিণাম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এসব জিনিস থাকে না।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে বেতন নির্ধারণে অংশ নিত শ্রমিকরা

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কেউ কি কল্পনা করতে পারেন বেতন নির্ধারণে শ্রমিকরা অংশ নেবেন? এখানে মালিকরা সর্বোচ্চ মুনাফা করতে যতটা কম বেতন দেওয়া যায় তারই চেষ্টা করে। ন্যায্য মজুরি পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা এখানে নেই। ভারতে মজুরি ব্যবস্থা তিন রকমের— (১) মিনিমাম ওয়েজ—যেটুকু না দিলে শ্রমিক তার পরিবার নিয়ে বাঁচতে পারে না, (২) ফেয়ার ওয়েজ—কোনও মতে বাঁচার মজুরি, (৩) লিভিং ওয়েজ অর্থাৎ বাঁচার মতো মজুরি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এটুকুও মালিকরা ঠিকমতো দেয় না।

সমাজতন্ত্রে মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদন হয় না বলে, বেতন বঞ্চনার প্রশ্ন আসে না। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে শ্রমিকদের আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হত বেতন কাঠামো। এই আলোচনায় শুধু শ্রমিক নেতারাই অংশগ্রহণ করতেন তা নয়, অংশগ্রহণ করতেন বিপুল সংখ্যক শ্রমিক। নতুন যৌথ যুক্তি হলে, সেই সংক্রান্ত আলোচনায় শ্রমিকদের উপস্থিতি থাকত ৯৫-১০০ শতাংশ। পুজিবাদী ব্যবস্থায় এই সুযোগ বা অধিকার স্বপ্নাতীত। সমাজতন্ত্র এটা পারে, কারণ এখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য কোনও মালিকের মুনাফা নয়, সমাজের কল্যাণ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও পরিচালিত হয় শ্রমিক স্বার্থে।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে নর-নারীর বেতনের কোনও বৈষম্য ছিল না

১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে একজন শ্রমিকের গড় পড়তা মজুরি ছিল বছরে ৯৯১ রুবল। পাঁচ বছরের মধ্যে ১৯৩৩ সাল নাগাদ মজুরি বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৪৪৭ রুবল। অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি প্রায় ২৪৮ শতাংশ। সরাসরি মজুরি হিসাবে এই আয় ছাড়াও শ্রমিকরা নানা ধরনের সুবিধা পেতেন, যাকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে বলা হয় সামাজিক মজুরি। এই সামাজিক মজুরি বলতে বোঝায় শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহণ, খাদ্যের সুযোগ-সুবিধা, অল্প ভাড়ায় বাসস্থানের ব্যবস্থা, বিনামূল্যে জ্বালানি, জল, বিদ্যুৎ, কাজের বিশেষ পোশাক। পুঁজিবাদী সমাজে সমকাজে সমমজুরি বহুক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। একই পরিমাণ কাজ করলেও মহিলাদের এখানে কম বেতন দেওয়া হয়। এখানে স্থায়ীকর্মী, অস্থায়ী কর্মী—এ জাতীয় নানা ভাগ। অস্থায়ী কর্মীরা বেশি কাজ করেও বহুক্ষেত্রে কম বেতন পেয়ে থাকে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে নর-নারীর বেতনের কোনও বৈষম্য ছিল না। এত আর্থিক সুবিধা যখন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে শ্রমিকরা ভোগ করতেন, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকদের মজুরির অবস্থাটা কী ছিল? ১৯২৮ সাল নাগাদ আমেরিকাতে শ্রমিকদের গড় বেতন কমে গিয়েছিল ৩৫ শতাংশ। জার্মানিতে কমে গিয়েছিল ৫০ শতাংশ।

শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা কমিয়েছিল সমাজতন্ত্র

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকের মুনাফা বাড়ানোর জন্য কাজের ঘণ্টা বাড়ানো হয়। পাশাপাশি কমানো হয় শ্রমিকদের বেতন। সমাজতন্ত্রে ঘটে এর উল্টো। কারণ সেখানে মুনাফা নেই। এখানে শ্রমিকের বেতন বাড়ে, কমে শ্রমিকদের কাজের সময়। ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতে মে দিবসের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। বিশ্বজুড়ে শ্রমিকদের এই দাবি কার্যকর করল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। বিপ্লবের পরেই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় দৈনিক কাজের সময় নির্ধারিত হল ৮ ঘণ্টা। তারপর ধীরে ধীরে শ্রম সময় আরও কমানো হয়। বিপ্লবের দশ বছরের মধ্যেই শ্রমসময় কমিয়ে করা হয় ৭ ঘণ্টা। বিপ্লবের ২০ বছরের মধ্যে শ্রম সময় আরও কমিয়ে করা হয় ৫ ঘণ্টা। ফলে সারাদিনে কারখানায় শিফটের সংখ্যা বেড়ে গেল। কর্মসংস্থানও বেড়ে গেল। শ্রমিকরা অন্যান্য সৃষ্টিশীল কাজে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেল।

সমাজতন্ত্রে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার সুরক্ষিত ছিল

বর্তমানে বহু পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকের সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ভারতে এখন মোদি সরকার কুখ্যাত 'লেবার কোড' এনে শ্রমিকের ধর্মঘট করার, সংগঠন করার অধিকার সঙ্কুচিত করছে। এ সবই করা হচ্ছে শ্রমিক শোষণ নির্ঝঞ্ঝাটে চালিয়ে যাওয়ার জন্য। রাশিয়ায় জারের আমলেও শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার ছিল না। কিন্তু সমাজতন্ত্রে শ্রমিকরাই উৎপাদনের মূল কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে শ্রমিকদের সংগঠন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। শ্রমিক সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল ট্রেড ইউনিয়নের। কারখানার পরিচালকমণ্ডলীর কোনও শ্রমিককে শাস্তি দেওয়ার অধিকার ছিল না। এমন সর্বব্যাপক অধিকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

সমাজতন্ত্র বাস্তবেই শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করেছিল

পুঁজিবাদী দেশেও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অভাবগ্রস্ত পরিবারে একটু খাবারের সংস্থানের জন্য বহু শিশুকে মজুরের কাজে নিযুক্ত হতে হয়। মালিকরাও এদের নিয়োগ করে কম বেতনে কাজ করিয়ে বেশি মুনাফা করার জন্য। সব পুঁজিবাদী দেশেই এটা কমবেশি হয়ে থাকে। ফলে 'শিশু শ্রম নিষিদ্ধ'—পুঁজিবাদে এই ঘোষণাটুকুই সার। তার বাস্তব প্রয়োগ নেই। কিন্তু সমাজতন্ত্রে শিশুর খাওয়া-পরা, শিক্ষা, চিকিৎসা, এক কথায় বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দিত সমাজতান্ত্রিক সরকার। সমাজতন্ত্র যে পুঁজিবাদ থেকে অনেক উন্নততর সমাজব্যবস্থা—এটা শুধু কথার কথা নয়, বাস্তব।

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে সমাজতন্ত্রে শ্রমিক ছাঁটাই হয় না

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মালিকরা কম শ্রমিক দিয়ে বেশি উৎপাদন করে। ফলে শ্রমিক অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। শ্রমিক ছাঁটাই হয়। সমাজতন্ত্রেও উৎপাদনের প্রাচুর্যের জন্য দরকার হয় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার। কিন্তু এখানে মুনাফার বিষয়টি যুক্ত নয় বলে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বাধ্যতা আসে না। সমাজতন্ত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার শুধু উৎপাদনই বাড়ায় না, শ্রমিককেও শ্রমভার থেকে মুক্তি দেয়। উন্নত প্রযুক্তি শ্রমিকের কাছে আশীর্বাদ হিসাবে আসে। দুই বিপরীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্যের ভিন্নতার জন্য দু'রকম ফল দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহার শ্রমিককে করে কর্মহারা। সমাজতন্ত্রে এই যন্ত্রণা নেই।

সমাজতন্ত্র নারীমুক্তির দরজা খুলে দিয়েছিল

বিপ্লব পূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের ১০ শতাংশ মানুষ ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মোল্লাতন্ত্রের নিদান অনুযায়ী মেয়েদের মানুষ বলেই মনে করা হত না। বোরখা পরিহিতা এই সব নারীরা ছিল তাদের স্বামীর কাছে কেনা পণ্যের মতো। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীরা স্বামীর নিকটতম আত্মীয়ের সম্পত্তিতে পরিণত হত। তৈজসপত্রের মতো তাকেও বিক্রি করে দেওয়া যেত। খ্রিস্টান পরিবারগুলোর অবস্থাও ছিল একই রকম। স্বামীর বিরুদ্ধে এই সব পরিবারের মেয়েদের কোনও আইনি অধিকার ছিল না। জার শাসিত রাশিয়ার আইনে বলা হত, 'সমস্ত বিষয়েই নারীরা স্বামীকে মেনে চলতে বাধ্য। কোনও মতেই সে স্বামীর মতের বাইরে যেতে পারবে না।' কোনও বিবাহিত নারীকে পাসপোর্ট দেওয়া হত না। স্বামীর সঙ্গ ছাড়া তাঁর বাইরে যাওয়ারও কোনও উপায় ছিল না। কর্মরত মহিলাদের ৭৫ শতাংশ ছিল নিরক্ষর। আর কৃষক রমণীদের মধ্যে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল নামমাত্র। এই ছিল বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার সাধারণ নারীদের জীবনের বাস্তব চিত্র।

বিপ্লবের পর এই অবস্থার পরিবর্তনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি। বিপ্লবের এক বছর পর ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে মস্কোতে বসল প্রতম নিখিল শ্রমিক-কৃষক-নারী সম্মেলন। লেনিন বললেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই হতই না যদি অসংখ্য শ্রমজীবী নারী এতে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করতেন। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অন্যতম প্রাথমিক কাজ হল নারীর অধিকারের উপর সমস্ত বাধা অবলুপ্ত করা।

মহান লেনিন নারীদের দৈনন্দিন জীবনের ঘরোয়া কাজ থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর সামাজিক কর্মকাণ্ডের শরিক হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নারীদের একটা বিশাল সময় কেটে যায় শিশুদের পরিচর্যার জন্য। এই শিশু পালনের ভার থেকে নারীকে মুক্ত করা যাবে কী করে? এই প্রশ্নে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র বিশাল ও ব্যাপক

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

মিড ডে মিলের বরাদ্দ বৃদ্ধি এক টাকারও কম!

দু'বছর পর সরকার মিড ডে মিলের বরাদ্দ বাড়াল। শুরু থেকেই মিড ডে মিলের বরাদ্দ যে প্রয়োজনের তুলনায় অনেকখানিই কম, তেমন অভিযোগ প্রায় সব মহল থেকেই উঠে আসছিল। গত দু-বছরে জিনিসপত্রের দাম, গ্যাসের দাম কী হারে বেড়েছে তা কারও অজানা নয়। তা সত্ত্বেও সরকারি কর্তাব্যক্তিরা কী করে মাথাপিছু মাত্র ৪৮ এবং ৭২ পয়সা যথাক্রমে প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য বরাদ্দ বাড়ালেন তা ভেবে পাচ্ছি না। এই প্রকল্প তো চালু হয়েছিল দেশের বিরাট অংশের দরিদ্র নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির কথা ভেবে। এই নামমাত্র বরাদ্দে কি সেই পুষ্টি সম্ভব বলে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা নিজেরাও মনে করেন?

তা যদি না হয় তবে তো প্রকল্পের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়! নাকি জনকল্যাণে সরকার কতখানি তৎপর শুধুমাত্র তা দেখানো এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য? জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা বলছে, দেশের এক তৃতীয়াংশ শিশু এখনও অপুষ্টির শিকার। এই শিশুরা তো আমাদের দেশেরই সন্তান, ভবিষ্যতের নাগরিক। তাদের এমন অপুষ্ট অবস্থায় ফেলে রেখে দেশ কি সত্যিই এগোতে পারে? এই অপুষ্টি দূর করা তো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব কি রাষ্ট্র পরিচালকরা অস্বীকার করতে পারেন?

প্রধানমন্ত্রী ভারতকে অতি দ্রুত ৫ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দেশে পরিণত করার কথা অহরহ বলেন। বলেন, ভারত অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অঙ্কে বিশ্বের বহু দেশকে টেক্কা দিয়েছে। যদি আমরা আমাদের শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগানটুকুও না দিতে পারি তা হলে এ-সব কোন প্রয়োজনে? তা কি কেবল দেশের বিরাট অংশের মানুষকে অর্ধাহার, অনাহার আর অপুষ্টিতে ফেলে রেখে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির সম্পদের পাহাড়কে আরও উঁচু করে তুলতে?

মাঝে মাঝে ভাবি, যাঁরা শিশুদের জন্য এই নামমাত্র বরাদ্দ বাড়ালেন তাঁদের কি একবারের জন্যও অভুক্ত, ক্ষুধার্ত সেই শিশুদের মুখগুলি মনে পড়েছিল? আচ্ছা, তাঁরা নিজেরাও তো পিতা-মাতা! তাঁরা কি নিজেদের সন্তানদের কখনও ওই শিশুদের জায়গায় বসিয়ে দেখেছেন? যখন তারা নিজেদের সন্তানদের আদর করে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যাবতীয় সামগ্রী খাওয়ান, তখন কি একবারের জন্যও এই সব অপুষ্ট, অভুক্ত শিশুগুলির কথা মনে পড়ে? যদি পড়ত তবে কি তাঁরা পারতেন এই শিশুদের সাথে এমন নির্মম পরিহাস করতে? নাকি তারা মনে করেন তাদের সন্তানরা সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, আর ওদের জন্মসঙ্গী দুর্ভাগ্য? 'আমাদের সন্তান, ওদের সন্তান'- এই বিভাজন ভাবনাই কি তাঁদের এমন বরাদ্দে প্ররোচিত করেছে? যদি তাই হয়ে থাকে তবে তার থেকে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না।

শিলাই মণ্ডল
গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর

রেলের সর্বাত্মক বেসরকারিকরণ

প্রতিবাদে রেলমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের স্মারকলিপি

ভারতীয় রেলের বিভিন্ন কারখানা ও উৎপাদন সংস্থার আধুনিকীকরণের জন্য তৈরি সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন ফর মর্ডানাইজেশন অফ ওয়ার্কশপের ঝাঁপ এ বছরের পয়লা ডিসেম্বর থেকে বন্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রেলমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ।

মঞ্চের আহ্বায়ক, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ৩০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়ে বলেন, রেল সহ সামগ্রিক বেসরকারিকরণ বিরোধী নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে।

রেলের সামগ্রিক বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ায় একের পর এক রেলের কারখানা, অফিস, স্টেশন, বিভাগ, শেড ইত্যাদি হয় বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, নয়ত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আমলে এই প্রক্রিয়া আরও দ্রুততর হয়েছে। ইতিমধ্যে রেলের সাফাই, মেরামত, ক্যাটারিং, মাল পরিবহণ, রেল লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ সহ বহু কাজই বেসরকারি হাতে চলে গেছে। রেলের আটটি প্রোডাকশন ইউনিটকে ব্যক্তি মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য কর্পোরেটাইজড করা হচ্ছে। ১১৯টি রুটে ১৫১ জোড়া বেসরকারি ট্রেন চালানোর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ১৫০-এরও বেশি স্টেশন বিক্রি হওয়া শুরু হয়েছে। বেশিরভাগ স্টেশনে টিকিট বিক্রি করার রেলের নিজস্ব ব্যবস্থা একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ৭৬৫০ কোটি টাকায় ২৪ হাজার ৭০০ যন্ত্র কেনা হয়েছিল যে সংস্থায়, সেই সি ও এফ এম ও ডব্লিউ-কেও বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে বন্ধকরে দেওয়া হচ্ছে। আইআরসিটিসি এবং রেল টেল এই দুটি সংস্থাকেও বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অরগানাইজেশন ফর অল্টারনেটিভ ফুয়েল নামের সংস্থাটিকেও ইতিমধ্যে গুটিয়ে ফেলা হয়েছে।

এর প্রত্যক্ষ কুফল হিসাবে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে ব্যাপক পরিমাণে আর্থিক বোঝা চাপছে এবং আরও চাপবে। বেসরকারি ভেন্ডারদের কাছে টিকিট কাটতে গিয়ে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। বিভিন্ন প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে এক্সপ্রেস ঘোষণা করে দিয়ে ভাড়া তিন গুণেরও বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রেলের সাড়ে চার লাখ হেক্টরেরও বেশি জমি ব্যবসা করার জন্য বেসরকারি মালিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া শুরু হয়েছে। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি স্টেশনও তালিকায় রয়েছে।

এর ফলে রেল স্টেশন এবং রেললাইন সংলগ্ন ছোট দোকানদার, হকার, ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাঁরা তাদের জীবন জীবিকা থেকে বঞ্চিত হবেন।

আমরা ভারতীয় রেলের এই বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে সর্বস্তরের মেহনতি মানুষকে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

সমাজতন্ত্র যা দিতে পারে

পাঁচের পাতার পর

সামাজিক ব্যবস্থার আয়োজনের কথা চিন্তা করেছিল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের চিন্তা ছিল এই রকম— শিশু মাতা-পিতার অত্যন্ত আদরের, এটা ঠিকই, কিন্তু একই সাথে শিশু সামাজিক সম্পদও বটে। শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক। শিশুর উন্নত পরিচর্যায় মাতা-পিতার যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তেমনি সমাজের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে শিশুপরিচর্যার ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র যে ব্যাপক আয়োজন করেছিল বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার।

কিন্তু যাদের পরিবার ছিল না, ঘর-বাড়ি, বাবা-মা, কিছুই ছিল না, পথেই যারা দিন কাটাত, পথেই যারা সবার অগোচরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করত সেই পথ শিশুদের জন্য কী ব্যবস্থা করেছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র? এদের সম্পর্কে ইরিয়া স্কারিয়াতিনা লিখছেন, অনেক আগে আমি মস্কো ও লেনিনগ্রাদের রাস্তায় দেখেছি অস্থিচর্ম সার, ঢুলু ঢুলু চোখ, কৃষ বিদ্বেষভরা মুখ। ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে ভিক্ষা করত। ... কখনও কখনও রাতের বেলায় নিঃসঙ্গ পথিককে ছিনতাই করত ...। মৃতপ্রায়, রোগগ্রস্ত, বিকৃত কিশোর-কিশোরীরা থাকত রাস্তার চারপাশে গাড়ি বারান্দায়। দিনের বেলায় ঘুমাত আর রাতে লোকচক্ষুর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসত। পরিষ্কার মনে আছে, অনেক আগে মস্কো স্টেশনে শীতের রাতে একটু গরম হওয়ার জন্য এই ধরনের কিশোর-কিশোরীরা স্তূপাকৃতি হয়ে পড়ে আছে এ আমি দেখেছি। কী খারাপই না লাগত।

সোভিয়েত সরকার সিদ্ধান্ত নিল চিরকালের জন্য এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। বড় বড় স্টেশনে অভিযান চালিয়ে এদেরকে আনা হল। পথশিশুদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা কমিউনগুলোতে ভর্তি করা হল। যারা অসুস্থ তাদের হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করে সুস্থ করার পর অন্যদের সাথে মেলামেশা করতে দেওয়া হল। প্রথম প্রথম শিশুরা বন্য প্রাণীর মতো মত্ত আচরণ করত। তারপর পরিবেশ তাদের প্রভাবিত করল। জীবনের নানা দিক সম্পর্কে তারা উৎসাহিত হল। খেলাধূলা, পড়াশোনা সম্পর্কে আকর্ষণ বোধ করল। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হতে হতে তারা একেবারে স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হল। (চলবে)

সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে এমএসসি-র সম্মেলন

মুর্শিদাবাদ ঃ মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৬ নভেম্বর দেড় শতাধিক ডাক্তার আধিকারিক-চিকিৎসক-নার্স-প্যারা মেডিকেল কর্মী ও গ্রামীণ চিকিৎসক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বহরমপুরের কালেক্টরেট ক্লাব হলে। দাবি ছিল, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনমন ও সার্বিক বেসরকারিকরণ প্রতিরোধ, ওষুধের দাম কমানো, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ওষুধ ছাঁটাইয়ের সার্কুলার প্রত্যাহার, সিবিএমই-র মাধ্যমে মেডিকেল শিক্ষার মানের অবনমন প্রতিরোধ, মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের সমস্ত বিভাগে সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালু, বহরমপুর সদর হাসপাতালকে মহকুমা হাসপাতালে পরিণত করা এবং ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

পতাকা উত্তোলন ও উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর খসড়া প্রস্তাব পেশ করা হয়। মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন ডাঃ অরুণাংশু ভট্টাচার্য, ডাঃ প্রজেশ বিশ্বাস ও ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি সাহা। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা। এমএসসি-র রাজ্য কোষাধ্যক্ষ ডাঃ নীলরতন নাইয়াও বক্তব্য রাখেন (ছবি)। সম্মেলন থেকে ডাঃ সুনীল হালদারকে সভাপতি এবং ডাঃ রবিউল আলমকে সম্পাদক করে ৫৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। এই সম্মেলনে ডেঙ্গু নিয়ে একটি সেমিনার হয়। পরিচালনা করেন ডাঃ প্রজেশ বিশ্বাস।

নদীয়া ঃ একই দাবিতে এমএসসি-র প্রথম নদীয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৬ অক্টোবর, রানাঘাট শহরের সরকার লজে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত, রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র, ডঃ অশোক সাহা প্রমুখ। প্রত্যেক বক্তাই কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ এবং রাজ্য বাজেটের কুড়ি শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করার কথা বলেন। ডাঃ সত্যজিৎ রায়কে সভাপতি, ডাঃ অপূর্ব রায়কে সম্পাদক এবং ডাঃ লক্ষ্মণ শর্মাকে কোষাধ্যক্ষ করে সংগঠনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবী ৭৫ বর্ষ ১১ সংখ্যার প্রথম পাতায় টেট আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্র-যুব মিছিলের যে ছবিটি ছাপা হয়েছে, তা মেদিনীপুর শহরের। ভুলক্রমে কলকাতার বলে লেখা হয়েছে। এর জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

ভোটের লোভে ভণ্ড সাধুর নির্লজ্জ পদসেবা

আবার প্যারোলে মুক্তি পেলেন হরিয়ানার ধর্মগুরু গুরমিত রাম রহিম। গত পাঁচ বছরে এই নিয়ে তিনবার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সুযোগ মিলে গেল দুটি খুন আর আশ্রমবাসী তরুণীদের ধর্ষণে অভিযুক্ত এই ভণ্ড ধর্মগুরুর। গত দু'বারের মতো এবারেও ঠিক ভোটের মুখেই জেল থেকে ছাড়া হল তাঁকে।

হরিয়ানার রোহতকের জেল থেকে ১৫ অক্টোবর ৪০ দিনের জন্য ছাড়া পেয়েছেন রাম-রহিম। কারণ, অক্টোবরের শেষ আর নভেম্বরের প্রথমে হরিয়ানায় পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের ভোট। সঙ্গে রয়েছে একটি বিধানসভা উপনির্বাচন। এ জন্য বিজেপি নেতাদের ভীষণ প্রয়োজন তাঁকে। ওই রাজ্য সহ লাগোয়া পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ জুড়ে রাম-রহিমের প্রভাব যথেষ্ট। তাই এই ভণ্ড ধর্মগুরুকে কাজে লাগিয়ে ভোটে ফয়দা তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন হরিয়ানার বিজেপি নেতারা। 'বাবা'-র আশীর্বাদ পেতে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। প্রতিদিন 'বাবা'র 'সৎসঙ্গ' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাঁর ভজনা চলছে। নিজের নিজের এলাকায় নিয়ে গিয়ে যাতে রাম-রহিমের পদধূলি বিলানো যায়, সেই চেষ্টা করছেন ভোটপ্রার্থী বিজেপি নেতারা, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপি সরকারের ডেপুটি স্পিকার থেকে শুরু করে করনালের মেয়র পর্যন্ত। এই মেয়র তো পরিষ্কার বলেছেন— 'পিতাজি-ই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই হওয়ার নয়।'

হরিয়ানায় বিজেপির অন্যতম নেত্রী এই মেয়র যাঁকে অবলীলায় ভক্তিভরে 'পিতাজি' বলে সম্বোধন করেছেন, তাঁর অপরাধের তালিকা দেখলে অবশ্য আঁতকে উঠতে হয়। আশ্রমে আশ্রয় নেওয়া অসহায় তরুণীদের উপর প্রতি রাতে যৌন-অত্যাচার চালাতেন রাম-রহিম। প্রভাবশালী এই লম্পট ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে পুলিশ-প্রশাসনে অভিযোগ করে লাভ হবে না জেনে দীর্ঘদিন মুখে বুজে সেই অত্যাচার সয়েছেন তাঁরা। অবশেষে সহ্যের চরম সীমায় পৌঁছে ২০০২ সালে আশ্রমে 'বাবা'-র লাগাতার অত্যাচারের শিকার এক তরুণী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি নামহীন চিঠি লেখেন। নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয় পুলিশ-প্রশাসন। মামলা দায়ের হয়। মেয়েটির পাশে দাঁড়ান আরও এক নির্যাতিতা। এগিয়ে আসেন আশ্রমবাসী এক কন্যার ভাই রণজিৎ সিং। চলতে থাকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার পালা। পাশাপাশি চলতে থাকে 'বাবা'র সাঙ্গপাঙ্গদের হুমকি, সন্ত্রাস। ২০০২ সালে খুন হয়ে যান রণজিৎ সিং। হরিয়ানার অসমসাহসী সাংবাদিক রামচন্দ্র ছত্রপতি যিনি স্থানীয় সংবাদপত্রে এই ধর্মগুরুর ভণ্ডামির পর্দা ফাঁস করে দিয়েছিলেন, খুন করা হয় তাঁকেও। তা সত্ত্বেও লড়াই জারি রেখেছিলেন অত্যাচারিতা তরুণীরা। শেষপর্যন্ত ২০১৭ সালে রাম-রহিমকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যখনই ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ছে, তখনই হাসিমুখে জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন রাম-রহিম। গরিবি, বেকারি, শিক্ষার অভাবে অসচেতন, কুসংস্কারগ্রস্ত জনসাধারণের উপর এই প্রতারক ধর্মগুরুটির যে প্রভাব রয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে ভোট লুটতে নেমে পড়ছেন বিজেপি নেতারা। এর আগে একই ভাবে রাম-রহিমকে কাজে লাগিয়েছে কংগ্রেস। ২০০৭-এ পাঞ্জাব বিধানসভা ভোটে খোলাখুলি কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিল তাঁর সংগঠন ডেরা সাচা সওদা। ২০১৪ সালের পর থেকে এই ভেকধারী সাধু বিজেপির সমর্থক বনে যান। সে বছরের লোকসভা ও হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে বিজেপি এঁর আশীর্বাদ পেয়েছিল। সেই থেকে এই লম্পট, প্রতারক ভণ্ড সাধুর নির্লজ্জ পদসেবায় ব্যগ্র হয়ে রয়েছেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। যখনই ভোট আসছে, বিনা বাধায় জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন রাম-রহিম।

প্রথমবার ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে পাঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে প্যারোলে মুক্তি পান রাম-রহিম। এরপর হরিয়ানার ৪৬টি পৌরসভায় নির্বাচনের ঘন্টা বাজলে আবার ছুটি দেওয়া হয় তাঁকে।

এবারও হরিয়ানার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের ঠিক আগে ১৪ অক্টোবর তৃতীয়বার জেল থেকে ছাড়া পেলেন তিনি।দেশের ভোট-রাজনীতির খেলোয়াড়দের এই হল আসল চেহারা। গরিব সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যেমন চরম প্রতারণা করছেন এই দুশ্চরিত্র সাধু, তেমনই ক্ষমতার লোভে নির্লজ্জের মতো তাঁরই পদসেবা করে চলেছেন এইসব নীতিহীন, ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা।

বিজেপি নেতাদের নির্লজ্জ মিথ্যাচার

তিনের পাতার পর

গায়ের জোরে ভঙ্গ করেন তবে আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক শাসন কথাগুলির কোনও মানে থাকে না। বিজেপি দাবি করে তারা গণতন্ত্র, সংবিধান এবং আইনের পরিকাঠামোর গণ্ডির মধ্যেই কাজ করে। তাঁদের এই আচরণে কোথায় গণতন্ত্র, কোথায় সংবিধান, কোথায় আইনের গণ্ডি? এ ভাবে আইনকে ইচ্ছেমতো নাকচ করার দ্বারা তাঁরা কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন? সমাজটাকে তাঁরা কি একটা জঙ্গলে পরিণত করতে চান? দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর কি এর পর মহিলাদের সম্মানরক্ষা বিষয়ে কোনও কথা বলার অধিকার থাকে? বাস্তবে এমন আচরণের দ্বারা তাঁরা নিজেদের স্বৈরাচারী বলেই প্রমাণ করেছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারীদের কোনও স্থান থাকতে পারে না, জনগণও তেমন নেতাদের মেনে নিতে পারে না। এরপর বিজেপির এই সব নেতাদের গণতন্ত্রের, আইনের বিষয়ে কোনও কথাকে দেশের মানুষ ভণ্ডামি ছাড়া আর কী মনে করতে পারে? যে ভাবে ধর্ষক ও খুনিদের মুক্তি দেওয়া হল, তাতে দেশের মহিলাদেরও কি আর বিজেপি নেতাদের থেকে কোনও জ্ঞানবাণী শোনা উচিত?

উল্লেখ্য, শাস্তি মকুবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কোর্টকেও সঠিক সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকার জন্য প্রয়োজন এই অন্যায়, অগণতান্ত্রিক, বেআইনি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত। সেই মত তৈরিতে দেশের সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে।

তেল কোম্পানির লোকসানের গল্প ফেঁদে জনগণের ঘাড়ে কোপ বিজেপি সরকারের

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী সম্প্রতি সরকারি কোষাগারথেকে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলিকে ২২ হাজার কোটি টাকা দেওয়ারঘোষণা করেছেন। এই টাকা দিয়ে তারা আগামী দিনে সম্ভাব্য লোকসান সামাল দেবে। কিন্তু কেন লোকসান?

একটানা বাড়তি দামের পর গত দুই মাসে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম নামছে। ব্যারেল প্রতি ১২০-১৩০ ডলার থেকে এখন ৮২-৮৪ ডলারে দাম নেমে এসেছে। তা আরও কমছে। দামের পতন ঠেকাতে তেল উৎপাদক দেশগুলোর সংগঠন ওপেক উৎপাদন ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ ভারতে এখনও তার কমার কোনও লক্ষণ নেই। সরকারের মতলব যা বোঝা যাচ্ছে, তারা দাম বাড়ানোর জন্যই আছে। দাম কমানোর ব্যাপারে নেই। তা হলে লোকসানের বদলে বিপুল লাভই তো করেছে তেল কোম্পানিগুলি! সরকার এখন অজুহাত করছে ওপেকের উৎপাদন কমানোর ঘোষণাকে। কিন্তু তা শুরু হতেও দেরি আছে। আদৌ উৎপাদন কমবে কতটা তা নিয়েও অনিশ্চয়তা আছে।

গত এপ্রিল থেকে ভারত সরকার এবং তেল কোম্পানিগুলি ক্রমাগত তেলের দাম বাড়িয়ে চলছিল। বাড়তে বাড়তে তা পেট্রলে ১৩০ টাকা লিটার এবং ডিজেলে ১১০ টাকার বেশি দাঁড়িয়ে যায়। এলপিজি বা রান্নার গ্যাসের দামও ১২০০ টাকার কাছাকাছি, এমনকি গরিব মানুষের জ্বালানি কেরোসিন ১০০ টাকা লিটার। অজুহাত ছিল বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম বাড়ছে, তাই তেল আমদানি করতে খরচ বেশি পড়ছে। অথচ ২০২০-২১ দুই বছর ধরে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম একেবারে তলানিতে ঠেকেছিল তখন কি তেলের দাম ভারতে কমেছিল? উত্তরটা জানা, কমা দূরে থাক সেই সময় ভারত সরকার ক্রমাগত উৎপাদন শুল্ক এবং সেস ও অন্যান্য কর বাড়িয়ে তেলের দাম কমতে দেয়নি। অথচ বিশ্ববাজারে তা একটু বাড়তেই দেশে তা বেড়েছে চড়চড় করে। আবার যখন তেলের দাম কমতে শুরু করেছে তখনও সরকার ভারতে তা কমতে দিচ্ছে না। সাধারণ মানুষের ঘাড়ে এমনিতেই সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিপুল বোঝা চেপে আছে। তার ওপর তেলের এই বাড়তি দাম সে বোঝাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক যুক্তি দিচ্ছে ওপেক তেল উৎপাদন কমালে অশোধিত তেলের পড়তি দাম আবার বাড়বে। তখন তেল কোম্পানির ক্ষতি হবে, অথচ গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় এখনই দাম বাড়ানো সমস্যার। অতএব জনগণের পয়সায় তেল কোম্পানিকে ভর্তুকি দেওয়া হবে।

সরকার যে সত্যটা চেপে যাচ্ছে, প্রথমত, বাড়তি দাম থাকাকালীন অতি সস্তায় রাশিয়া থেকে অশোধিত তেল আমদানি করেছে রিলায়েন্স কিংবা আদানি গোষ্ঠীর তেল কোম্পানিগুলি। এই তেল তারা নিজেদের শোধনাগার থেকে সরাসরি বিদেশে চড়াদামে বেচেছে। দেশের মানুষ এই সস্তা তেলের নাগাল পায়নি। দ্বিতীয়ত, কোনও তেল কোম্পানি একদিনের জন্য হলেও লোকসান করেছে এ তথ্য ডাহা মিথ্যে। লোকসানের যে গল্প তারাশোনায়, তা হল তেল ব্যবসার পরিভাষায় 'আন্ডার রিকভারি'। অর্থাৎ তাদের হিসাবে যতটা দাম তারা পেতে চায় তার থেকে যতটা আদায় কম হবে সেটাকেই বলা হচ্ছে ক্ষতি। এর সাথে বাস্তবের ক্ষতির কোনও সম্পর্ক নেই। এই হিসাবের ফলেই কোম্পানিগুলো খুশিমতো তেলের দাম বাড়ায়। এর সাথে যুক্ত করা হয় ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট প্রাইস প্যারিটি। এর মানে হল দেশে উৎপাদিত তেল এবং গ্যাসকেও আমদানিকৃত হিসেবে দেখিয়ে আমদানির খরচ, কাস্টমস, বন্দরের খরচ, এক্সাইজ ইত্যাদি সব কর দিতে হয়েছে বলে কোম্পানি দেখায়।

ফলে বাস্তবের থেকে অনেক বেশি উৎপাদন খরচ দেখিয়ে কোম্পানিগুলি তেল গ্যাসের দাম ঠিক করে। আবার দেশের অভ্যন্তরে তেল বেচার সময় কাজে লাগে এক্সপোর্ট প্রাইস প্যারিটি। সব তেলটাই রপ্তানি হচ্ছে দেখিয়ে নানা খরচ হয়েছে, কর দিতে হয়েছে দেখানো হয়। অথচ সবটাই মনগড়া। এভাবে কার্যত জনগণকে প্রতারণা করে তেল কোম্পানিগুলি লুটের কারবার চালায়। সরকার তার সহযোগী। কারণ সরকার যেমন যথেচ্ছ কর বসিয়ে তেল গ্যাস থেকে ৩ লক্ষ কোটি টাকা আদায় করে। সেই টাকা সরকার জনকল্যাণের নাম করে কর্পোরেট করে ছাড় দেয়, পুঁজিপতিদের নানা ছাড় ও উপহার দেয়। এখন আবার ২২ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে কোম্পানিদেরই। অথচ জনগণের জন্য গ্যাস তেলের সব ভর্তুকি বন্ধ।

সরকার টাকার অভাবের অজুহাত দেখিয়ে ১০০ দিনের কাজ, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বরাদ্দ কমাচ্ছে। অথচ যে সব তেল কোম্পানি বছরে ২৪ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত মুনাফা করেছে তাদের মিথ্যে লোকসানের গল্প শুনিয়ে জনগণের ঘাড়ে নতুন কোপ বসানোর ষড়যন্ত্র চলছে। লোকসান পোষাতে আবার বাড়বে তেল গ্যাসের দাম। এখনই এই লুটের কারবারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

মতবিনিময় সভা বাংলাদেশে

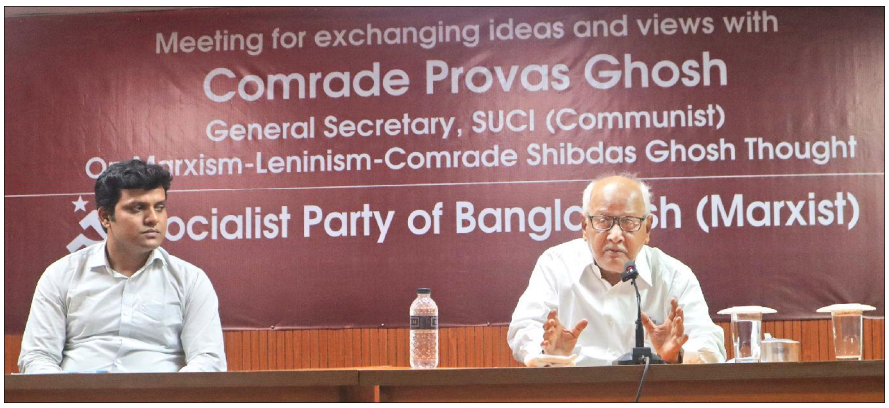

আলোচনা করছেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর ডান দিকে সভার সভাপতি কমরেড মাসুদ রানা। (নিচে) উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

২০-২২ অক্টোবর বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র নেতাকর্মীদের সাথে ভারতের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এটি আয়োজন করে বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম। দলের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় মার্কসবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, পার্টি গঠন, বিপ্লবী জীবন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তার পতনের কারণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। কমরেড প্রভাস ঘোষ কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসেবে তাঁর চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ২৩ অক্টোবর বিকেলে কমরেড প্রভাস ঘোষ বাংলাদেশের বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট আয়োজিত 'মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সংকট ঃ ছাত্রদের করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন।

দিল্লিতে ইন্দো-কোরিয়ান মৈত্রী সমিতির বৈঠক

উত্তর কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টির ৭৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে ইন্দো-কোরিয়ান মৈত্রী সমিতির আহ্বানে ১১ অক্টোবর উত্তর কোরিয়ার দিল্লি দূতাবাস থেকে একটি সভার আয়োজন করা হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে আমন্ত্রিত হয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দিল্লি রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মা (ছবিতে ভাষণরত) ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরামের পক্ষ থেকে কমরেড কে সি তেওয়ারি ওই বৈঠকে যোগ দেন। সভায় কমরেড প্রাণ শর্মা উত্তর কোরিয়ার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দৃঢ় ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে বিজ্ঞানকে বিকৃত করার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক

জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের নামে বিজ্ঞানকে বিকৃত করার বিরুদ্ধে সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির তরফে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কে পি বসু হলে ৩০ অক্টোবর একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির সহ উপাচার্য অধ্যাপক নবীন দাস বলেন, প্রশ্ন করার প্রবণতা যদি কমতে থাকে, তবে সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। প্রশ্নের বদলে, নিরীক্ষার বদলে বিশ্বাসকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হচ্ছে। ফলে প্রকৃত শিক্ষার অপমৃত্যু ঘটছে। বর্তমান শাসকরা ঠিক এই জিনিসটাই করতে চাইছে। জাতীয় শিক্ষানীতির এটাই বিপদ।

ঢাকার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশানাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক উজ্জ্বল চৌধুরী বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাজেট ক্রমাগত কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু বিজেপি সরকার নয়, কংগ্রেস সরকারও শিক্ষায় এমনভাবেই বাজেট হ্রাস করেছিল। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে তুলে দিয়ে শিক্ষার

বেসরকারিকরণ ঠিক নয়। এতে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পার্থিব বসু বলেন, অপবিজ্ঞানকে নিরন্তর বিজ্ঞান বলে প্রচার চলছে। আরএসএস-এর উদ্যোগে অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবেই এটা ঘটানো হচ্ছে। বৈমানিক শাস্ত্রের মতো নানা অপবিজ্ঞানকে প্রমাণ করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় সরকার প্রচুর অর্থও যোগান দিচ্ছে। 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম'-এর নামে এসব কুসংস্কার ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে।

ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী এবং আইজার কলকাতার অধ্যাপক ডঃ সৌমিত্র ব্যানার্জী তাঁর আলোচনায় দেখান, ভারতে বিজ্ঞানকে শুধু বিষয় হিসাবে পড়ানো হলেও প্রকৃত বিজ্ঞানের চর্চা কখনওই কার্যকরীভাবে হয়নি। অনেক বিজ্ঞানের অধ্যাপকও তাবিজ, আংটি ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। সাধারণভাবে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাতে এই বিপদটা নিহিত ছিল। তাই জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে অপবিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে সুবিধা হচ্ছে। সম্প্রতি গোমূত্র, গোবর ইত্যাদির গবেষণার জন্য ৪৯টি প্রজেক্ট প্রোপোজাল জমা পড়েছে এবং এজন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের নামেই এই অর্থহীন জিনিস চলছে। মানুষের যুক্তিবাদী মননকে মেরে একটা ফ্যাসিবাদী পরিবেশ গড়ে তোলাই এই শিক্ষানীতির আসল উদ্দেশ্য।

সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতি এবং প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী বলেন, গত দশ বছরে শিক্ষায় বেসরকারিকরণ তীব্রতর হয়েছে। ভয়াবহ বিপদ হচ্ছে বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসেরও বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে আর্যরা বাইরে থেকে আসেনি, এদেশেই তারা ছিল। যাঁরা এদেশ থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, সেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের নাম এই শিক্ষানীতিতে নেই। যাঁরা এদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু করিয়েছিলেন, সেই জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নামও নেই। মধ্যযুগে এদেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ হবার কারণ হিসেবে প্রফুল্ল রায় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকেই দায়ী করে গেছেন। তাই তাঁদের নাম এই শিক্ষানীতিতে নেই। পরবর্তী প্রজন্মকে মেরুদণ্ডহীন, পরনির্ভর করে তোলবার যে অপচেষ্টা, তার বিরুদ্ধে আপসহীন সামাজিক আন্দোলন ছাড়া সেই বিপদকে রোখা যাবে না।

সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক তরুণকান্তি নস্কর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন, ভারতের শিক্ষানীতির প্রশ্নে আমাদের সংবিধানের ৫২এ (এইচ) ধারায় ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হিসাবে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টির যে প্রতিশ্রুতি আছে, জাতীয় শিক্ষানীতি ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম চালু করার নামে তাকে ধ্বংস করতে চাইছে। নিউটন, পিথাগোরাস, কোপারনিকাস প্রমুখের আবিষ্কার সবই বেদে ছিল, এমন প্রচার করা হচ্ছে, যা অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক।

এসব কথা বলে ছাত্রদের মধ্যে কোন বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁরা সৃষ্টি করবেন? এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com